ক্ষিতিমোহনের ‘ভারত পরিক্রমা’ : ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুমুখী পাঠ

সিদ্ধার্থ খাঁড়া

বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিবিম্বিত করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন। তার মননে ও চিন্তনে যে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেতনা ছিল তা প্রবন্ধ গুলির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারত তথা বৈদিক সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, উৎসব, শিল্প, শক্তিচেতনা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও হিন্দু-মুসলিম যোগ সাধনাকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপযুক্ত নির্দিষ্ট তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। অতীত ভারতের অখণ্ড আদর্শকে বর্তমান আধুনিক ভারত নির্মাণের সংকল্পে ব্যবহার করেছেন। অতীত ভারতের শিক্ষার পদ্ধতি, নীতি ও রীতির আদলে আধুনিক ভারতের শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। দেবতা নয় মানব ধর্মই বৈষম্যহীন অখণ্ড ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে তার বিশ্বাস। সাম্য-মৈত্রী-করুণা এবং জ্ঞান-প্রেম-কর্মের দ্বারা প্রাচ্য ভারত য়ুরোপ তথা পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলনের কাণ্ডারী হয়ে উঠবে। ক্ষিতিমোহনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও চেতনা আধুনিক নব ভারত সৃজনের চেষ্টাকে সার্থক করে তুলবে অদূর ভবিষ্যতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির আদান প্রদান দুই ভিন্ন জাতির মিলন সেতুকে সুন্দর ও মজবুত করে তুলবে।

আনন্দবাজার, দেশ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যা ও সাধারণ বার্ষিক সংখ্যায় বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ষাটটি প্রবন্ধকে ‘ভারত পরিক্রমার’ অন্তর্ভুক্ত করেন গবেষক সম্পাদক প্রণতি মুখোপাধ্যায়। একজন গবেষকের চোখ দিয়ে ‘ভারত পরিক্রমা’ পরিক্রমণ, দর্শন ও বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য। সংস্কৃতি ও তার সাধনাকে কেন্দ্র করে বহু ভিন্ন স্বাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সংস্কৃতির যোগসাধনা’ প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতনের হিন্দি ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে একটি স্বাগতবাণী যা ‘প্রবাসীতে’ ফাল্গুন ১৩৪৪ এ প্রকাশিত। এই স্বাগতবাণীতে রবীন্দ্রনাথের মহাতীর্থ শান্তিনিকেতন নির্মাণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিকতার সীমারেখা ভেদ করে সকল ভারতীয়ের জন্য হিন্দি ও

বাংলার সংস্কৃতির মিলন ঘটানো। তাই তিনি শান্তিনিকেতন নির্মাণ করেন। যে শান্তিনিকেতন হবে সকল মানবের মহামিলন ক্ষেত্র। তাই তিনি ভারতের সকল প্রদেশের সংস্কৃতিকে শান্তিনিকেতনে সমবেত করে সকল সংস্কৃতির সঙ্গে পরস্পরের মিলন ও পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন। এই প্রাদেশিকতার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে সর্ব মানবের সর্ব সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র করে তুলতে চেয়েছেন ভারতবর্ষকে। বৈদিক, আবেস্তিক, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও ইসলামের সাধনা এখানে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিব্বত, চিন ও বৃহত্তর ভারতের সাধনা এই বিশ্বভারতীতে যোগের মিলন সেতু তৈরি করেছে। সংস্কৃতি আদান প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর বিকশিত হয়েছে। এই যোগের মধ্যে রয়েছে প্রেমের আলিঙ্গন যা আত্মিক ও কায়িকভাবে ভারতকে শক্তিশালী করে তুলবে। সকল জলবিন্দু যেমন মহাসাগরের মিলনের ডাক উপেক্ষা করতে পারে না শেষ পর্যন্ত মহাসাগরে মেশে তেমনি সকল মানুষ বিশ্বভারতীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র উপেক্ষা করতে না পেরে প্রেমে ও জ্ঞানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিশ্বজনীন মানবসত্য নির্মাণ করে। এই মহাযোগের ডাক দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে যোগসাধনার মধ্যে আছে দ্বন্দ্বহীন ও সংঘাতহীন এক মানবসত্য যা ভালোবাসায় রূপান্তরিত।

‘সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ’ প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৪৭ এ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে লেখক ক্ষিতিমোহন সেন দ্বন্দ্ব ও উদ্যমকেই জীবনীশক্তি উদ্ভাবনের কারণ বলে মনে করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাধা সংস্কৃতির মহত্তর দিকটিকে উন্মোচিত করে। জীবন ও সংস্কৃতির উন্নতি ও পরিপোষণের জন্য দ্বন্দ্ব ও বাধার প্রয়োজন। জীর্ণ ও পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন ও ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও আঘাতে নিজের উচ্চতর আদর্শ ও সত্যকে খুঁজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে জাতির সামনে তুলে ধরে। নতুন ও ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগের ফলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব জেগে ওঠে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সংস্কৃতির মহত্তর দিকটিকে সকলের সামনে তুলে ধরে। মধ্যযুগে মুসলমানদের আসার পর মহাপ্রাণ ভারতীয়গণ নিজেদের পুরাতন ভক্তি ও মহত্তর সাধনার বিস্মৃত অধ্যায় আবার নতুন করে খুঁজে পেয়েছিল। ভারতীয়দের এই হারানো ও লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করার মূলে রয়েছে মুসলমান জাতির সংস্পর্শ ও সংঘাত। দুই জাতির পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতাই নিজ নিজ জাতির সংস্কৃতির উৎকর্ষতম দিককে প্রকট করে তোলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়

সংস্কৃতির মিলনে উভয় সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে ও নিজের মহত্তর উপলব্ধিকে বিশ্বের আঙিনায় মেলে ধরেছে।

গ্রাম্য দীনতা ও জীর্ণ সুপ্ত আদর্শ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাতে ভেঙে গিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিশীলিত, নতুন ও বিকশিত করে তোলে। শক, হূণ প্রভৃতি জাতি ভারতের প্রবলতর সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় সভ্যতা তার প্রাচীন সম্পদ নতুন করে ফিরে পেয়েছে। গ্রাম্য দীনতা ঘুচে গিয়ে শহুরে আধুনিকতা স্পষ্ট হয়েছে জাতির অভ্যন্তরে। বাধার বিরুদ্ধে আত্মপ্রয়োগ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আত্মশক্তিকে যেমন বাড়ায় তেমনি চলার পথে নতুন করে উদ্যম ও প্রেরণা তৈরি করে। এই দ্বন্দ্ব ও বাধা সংস্কৃতিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। শুধু সংস্কৃতি নয় তার সঙ্গে যুক্ত জীবনকেও বাঁচার জন্য উদ্যম ও শ্রম দান করে। জীবন ও সংস্কৃতির ধর্মই হল প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যার জন্য প্রয়োজন দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘাত।

'ভারতের সাম্য মৈত্রীর সাধনা' প্রবন্ধটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৫৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। ধর্ম ও সাম্য-মৈত্রীর যুগ্ম সাধনা কীভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতিকে নির্মাণ করেছে এবং কীভাবে পাশ্চাত্যের সঙ্গে আত্মীয়তা ও মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি করে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে এক স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে তা ক্ষিতিমোহন সেন ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মতো ধর্ম এবং সাম্য-মৈত্রী পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ভারতবর্ষের অন্তরকে বিকশিত করেছে। ধর্ম কেবল মুক্তিকে নিশ্চিত করে কিন্তু মৈত্রী অতিমুক্তিকে নিশ্চিত করে তোলে।

ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাধনায় দেবতাই প্রধান লক্ষ্য কিন্তু মৈত্রী-সাম্যের সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মানবজগতে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ করেননি। তাই তিনি অন্নবস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস যথাযোগ্যভাবে সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়াকেই ধর্ম বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তার ভাগবতীয় উক্তি-'অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো/ভূতেভ্যশ্চ যথা ইতঃ।'[১] অর্থাৎ সর্বজীবের মধ্যে অন্নবস্ত্রকে সমভাবে বন্টন করাটাই ধর্ম। পেটভরা অন্নে সকলের সমান অধিকার। যিনি অকারণে ক্ষুধার্তদের বঞ্চিত করেন তিনি সামাজিক চোর। তাকে দণ্ড দেওয়াই সমাজের

কর্তব্য। কৃষ্ণের এই সম বন্টনের নীতি বিশ শতকে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের স্মৃতিকে স্মরণ করায়। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকেরা অন্নের সমবন্টনের জন্য সেদিন লড়াই করেছিল। এই বঞ্চিত ও ক্ষুধার্ত মানুষরা সেদিন বুর্জোয়াদের সামাজিক দণ্ডের দাবি জানিয়েছিল। শাসকের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ ও লড়াই সেদিন জয়লাভ করেছিল। রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের সাম্যবাদ গঠনের পরিকল্পনার মধ্যে রাশিয়ার সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র গঠনের বাস্তব ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে মৈত্রীর সূচনা হয়েছে বৈদিক যুগে। মৈত্রীর মূল কথা হল কল্যাণ। ভারতবর্ষ এই কল্যাণ মন্ত্রের দ্বারাই ব্রহ্মদেশ থেকে যবদ্বীপ, তিব্বত থেকে জাপান প্রভৃতি দেশকে আত্মীয়তা ও মিত্রতার শৃঙ্খলে বাঁধতে পেরেছে। যাগযজ্ঞ দিয়ে যা সম্ভব হতো না তা মৈত্রী দিয়ে হয়েছে। অপরিসীম দয়া ও প্রেমভাবই মৈত্রীভাবের জন্ম দেয়। বাধাশূন্য ও হিংসা শূন্যভাবে অপরিসীম দয়াই মানুষের সত্তাকে সাম্য ও মিলনের সঙ্গে স্বার্থহীন ভাবে যুক্ত করতে পারে। ভারতের মৈত্রীমন্ত্র হল অভয়মন্ত্র। যে মন্ত্র মানুষের জীবনের সকল দিককে অভয়দান করেছে। ধর্ম যদি মুক্তি হয় তাহলে মৈত্রী অবশ্যই অতিমুক্তি। আমাদের একুশ শতকের সমস্ত জগতের মূল সমস্যা হল মৈত্রী না থাকা। যদি আবার আমরা সে বেদের প্রাচীন মৈত্রী সাধনা জাগিয়ে তুলতে পারি তবে আবার আধুনিক মানুষ তথা আধুনিক পৃথিবী শান্তিময়ী হয়ে উঠবে। এই মৈত্রীর সাধনা আবার জেগে উঠলে অন্তরীক্ষে, জলে, বনস্পতিতে এবং বিশ্বদেবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে পাপমুক্ত হয়ে বিশ্বচরাচরে পরম শান্তির মুহূর্ত অনুভূত হবে। সকল ক্রুরতা, হিংস্রতা দূরীভূত হয়ে এক পরম শান্তি বিরাজ করবে যেখানে মানবের কল্যাণ হবে মূলমন্ত্র।

‘অখণ্ড ভারতের সাধনা’ প্রবন্ধটি দেশ পত্রিকায় ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে অটুট রাখতে রবীন্দ্রনাথ কী ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতবর্ষকে কেন অখণ্ড বলা হয়? কারা ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এই প্রবন্ধে। রাষ্ট্রশাসন ও ব্যাবসা বাণিজ্যের নামে যে ইংরেজ ভারতকে চিরদিন শোষণ ও পেষণ করেছেন সেই ইংরেজ দেশ ছাড়বার আগে ভারতকে বিভক্ত করে দিয়ে যায়। শুধু যে ভৌগোলিক ভাবে খণ্ড করেছে তা নয় ঘরে বাইরে ভাঙন ও ধরিয়েছে এই ইংরেজরা। অখণ্ডিত ভারতের সত্তাকে টুকরো টুকরো

করতে চেয়েছে ব্রিটিশরা। স্বার্থ, বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণতা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অখণ্ড ভারতকে বিচ্ছিন্ন করেছে ইংরেজ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই খণ্ড ভারতের অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছে তার গানে, কবিতায় ও রাখী বন্ধনের উৎসবে।

যুগ বিধাতা ও ইতিহাসনিয়ন্তার নির্দেশে একদিন যে ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল সেই ইংরেজ ভারতবাসীর মধ্যে প্রাদেশিকতার আগুন, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও জাতিভেদের রাজনীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষ এক অখণ্ড সাধনাভূমি। তার ঐক্য ও অখণ্ডতা চারিদিকে বিস্তৃত। ধর্ম, সংস্কৃতি, তীর্থ, নদী, মন্ত্র, উৎসব ও আধ্যাত্মিকতায় সবক্ষেত্রে একই তার সাধনা। এই অখণ্ড দেশের সর্বত্র বৈদিক সন্ধ্যা-গায়ত্রী ও বিবাহ অনুষ্ঠানের মন্ত্র এক। বিষ্ণু, শিব ও দেবীর অর্চনা ও সর্বত্র একই। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ সবখানে পূজার দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণ ও মহাভারত সবস্থানে সমাদর লাভ করেছে। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা জাতির আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভারতের বাহান্ন পীঠে একই দেবী জগন্মাতার বাহান্নটি অঙ্গ। কাশীতে সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কাশীর ঘাটে সকল প্রদেশের তীর্থার্থীদের স্থান। সারা ভারতে জাতিভেদ একইরকম, সারাদেশে সমাজব্যবস্থা একই। মাস ও বৎসরের গণনা সব দেশে একইরকম। সবখানে শারদীয়া, বাসন্তীদেবী, পূজা, দোল ও রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্নান কালে সকল নদীকেই আবাহন করতে হয়।গঙ্গা সকলের কাছে চির পবিত্র। মৃত্যুর পরেও একই মন্ত্র পাঠ করতে হয় দেহকে স্থান করতে। মন্ত্রটি হল-" গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃশিলোচ্চয়া

কুরুক্ষেত্রং চ গঙ্গাং চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম।"[২]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ভারতবর্ষ অখণ্ডতার ধ্যান করেছে ইংরেজ এসে সেই ধ্যান ভঙ্গ করতে চাইলে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদের বিষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বিভক্ত ভারতে হিন্দু যাতে হিন্দুকে চিরদিন জ্বালাতে পারে তার জন্য প্রাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ইংরেজ। সিডিউল এবং নন সিডিউল নামে দুটি ভিন্ন জাতি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে ভারতের রাজনীতিকে সংঘাতের মুখোমুখি করে তুলেছে।

১৯২৪ সালে লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ তথা য়ুরোপীয়দের পরাজয়কে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই চিনদেশের নেতা লিয়াং-চি-চাওকে বলেছিলেন-'ইংরাজ ও য়ুরোপীয়রা

এশিয়া ছাড়িবে তাহার পূর্বসূচনা দেখিতেছি। কারণ, এশিয়াতে সর্বত্র লোক জাগিয়া উঠিতেছে। গৃহস্থ যতক্ষণ ততক্ষণই তস্করদের সুযোগ। গৃহস্থ জাগিলেই তস্করকে পলাইতে হয়।'[৩] ভারতবর্ষের জাগৃতি ইংরেজদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কিন্তু যাবার আগে তারা এদেশকে সংকীর্ণতা, দ্বেষ, হিংসা ও বিরোধের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও শিল্পে উন্নত জাপানকে এরাই দস্যুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে। ভারতে জাতিভেদ কালের নিয়মে একদিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল কিন্তু লোকগণনাতে, আদালতে ও হলফে সেই জাতিভেদকে ইংরেজরা প্রবল করে তুলেছিলেন। এই ইংরেজ নামক দুর্বৃত্তদের প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রামজ্বালানি বলে অভিহিত করেছেন। গ্রামজ্বালানিদের তৈরি করা এই বঙ্গবিভাগ দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই ৩০ শে আশ্বিন রাখীবন্ধন উৎসবের মধ্যে দিয়ে খণ্ডিত বাংলাকে এক করতে চেয়েছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুই বঙ্গের মানুষকে মিলিত করতে চেয়েছেন তিনি। এটাই তার রাখী বন্ধন উৎসবের প্রধান কারণ। এই রাখী পূর্ণিমার দিনই তার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু ভবিষ্যতের দারুণতম কোনো বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে দিয়ে যায়, যা হল ভারত বিভাগ। মৃত্যুর দ্বারা দুই বঙ্গের যোগসাধনার জন্য রাখী উৎসবের দীক্ষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিরকাল তিনি মানবের বিচ্ছেদের মধ্যে যোগের সন্ধান করেছেন তাই স্বার্থ-লোভ, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করে প্রেমের মিলনের জন্য ডাক দিয়েছেন। এই মহামিলন জুলুমবাজ ইংরেজদের দেশ ত্যাগ করাতে বাধ্য করবে বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তার গান-' এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো

আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ।'[৪]

য়ুরোপকেও রবীন্দ্রনাথ মহামিলনে ডাক দিয়েছেন। এই মহামিলনে ধনীও গরীবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। উচ্চ বর্গ ও নিম্ন বর্গের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই এই মহামিলনে। বুর্জোয়া ও শ্রমিকের কোনো ভেদ নেই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদচিহ্ন থাকবে না এই মিলনের ক্ষেত্রে। যেখানে সর্ব মানব সর্বজাতি মিলিত হবে স্বার্থ শূন্য ও বাসনা শূন্য হয়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন চেয়েছেন চিরদিন রবীন্দ্রনাথ। রাখী বন্ধনের মধ্যে দিয়ে যে শক্তির দ্বারা খণ্ডিত বঙ্গকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই শক্তি দিয়ে ১৯৪৭ সালে তিনি খণ্ডিত ভারতকেও যুক্ত করার উপযুক্ত সাধনার পথ দেখিয়েছেন। 'ভারতের চিত্রশিল্পে সাধনার যোগ' ও 'ভারতের স্থাপত্যশিল্পে

যুক্ত সাধনা' প্রবন্ধে হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতির ধর্মভেদহীন ও জাতিভেদহীন স্থাপত্য ও চিত্রের উৎকর্ষ দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। উভয় জাতির শিল্প গুণের দ্বারা ভারত সারা পৃথিবীতে স্থাপত্য ও চিত্রে এক ও অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে। 'বৈদিক যুগ হইতে বসন্তোৎসবের ধারা', 'উৎসবময় দোলপূর্ণিমা, 'বসন্ত সংবর্ধনা' 'বসন্ত উৎসবের করুণ আহ্বান', 'বসন্তোৎসব-প্রশস্তি ইত্যাদি বসন্ত উৎসব কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলিতে হিংসা ও সংকীর্ণতা ভেদ করে প্রেম ও মিলনের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। বসন্তের সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ দুই জাতির অন্তরের বৈষম্যকে দূর করেছে। বসন্তের সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকল ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কলমের ছোঁয়ায় এবং গানের সুরে ও নৃত্যের ছন্দে। সেখানে উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের কোনো ভেদ নেই। ধনী ও গরিবের কোনো বৈষম্য নেই। ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্যহীন এক সম্প্রীতির ঢেউ এই বসন্ত উৎসব। যেখানে প্রেমের জাগরণ ও প্রেমের মিলন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ ও কবীর বসন্তের প্রেমকে মিলনের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

শিক্ষা বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথমটি হল 'শিক্ষার স্বদেশী রূপ' আর দ্বিতীয়টি হল 'শিক্ষায় স্বাধীনতা'। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার দেশীয় রূপটি বিন্যস্ত হয়েছে 'শিক্ষার স্বদেশি রূপ'(১৯৩৬) প্রবন্ধে যেখানে গুরু ও শিষ্যের প্রীতির সম্বন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা ব্রহ্মচর্যের যুগে দেখতে পাওয়া যেত তা এখনকার সময়ে দেখতে পাওয়া কঠিন। তখনকার দিনে শিক্ষালাভের জন্য যে প্রবল আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখা গিয়েছিল তা উপনিষদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকুলতাই ভারতের চিরন্তন ধর্ম। শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহকে মর্যাদা দিতে কাশীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিভূমি গড়ে ওঠে। এই সকল শিক্ষালয়ে নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল অবারিত। প্রাচীন সেই শিক্ষাক্ষেত্রর আশ্রয় ছিল তপোবন।

কালের পরম্পরায় যুগের বিবর্তনে তপোবনের স্থানে জৈন ও বৌদ্ধ যুগে গড়ে উঠেছিল শিক্ষায়তনগুলি। বৌদ্ধ অথবা জৈন সব যুগেই শিক্ষার সব ভার বহন করতো সমাজ। সমাজই চিরদিন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীদের লালন পালন করেছে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু অধ্যাপকদের জীবনের সহজ অভাব ও সংকটগুলি মোচন করেছে। গ্রীকদের কাছে জ্ঞান ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাই ক্রই

বিক্রয়ের চল ছিল কিন্তু আমাদের ভারতে জ্ঞান সবার সাধনার সম্পদ অর্থাৎ সর্বজনীন তা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

বাংলাদেশে গুরুর গৃহই ছিল চতুষ্পাঠী সেখানে ছাত্ররা বাস করতো। গুরু তাদের পিতা এবং গুরুপত্নী তাদের মাতা। গুরুশিষ্য দুজনে দরিদ্র হলেও জ্ঞানে ও প্রীতিতে তারা ছিল যথেষ্ঠ ধনী। তাই গুরুগৃহের সঙ্গে প্রেমের যোগ এমন ছিল যে পাঠ সমাপ্ত হবার পর অশ্রুজলে বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হতো। অধ্যাপক নিজের সন্তান ও ছাত্রদের নিয়ে একসঙ্গে খেতেন এবং ঘুমাতেন। ছাত্র ও সন্তানের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। ছাত্রেরা বাড়ির ছেলেদের মতো উপদ্রব না করলে গুরুপত্নী রাগ করতেন। গুরু গৃহে ছাত্রজীবনের এই স্নেহের উৎপাত ও উপদ্রব আমাদের আধুনিক জীবনে কেবল স্মৃতি হয়ে যৌবনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। সেই মধুর স্মৃতিগুলি আজ নেই আছে শুধু ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অশ্রদ্ধা ও দূরত্ব । সেই দূরত্ব আজ আর ঘুচবে না। সীমাহীন স্নেহ এবং আন্তরিকতা আজ আর নেই। আজ গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখ দেখে। উপদ্রবহীন এই ছাত্রেরাই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থেকে দূরে সরে গিয়ে অধ্যাপকের প্রকৃত জ্ঞান লাভে অসমর্থ হয়।

তখনকার দিনে চতুষ্পাঠীর প্রধান বিশেষত্ব ছিল শুচিতা। পড়াতে পড়াতে কেউ যদি কোনো অশ্রাব্য কথা বলতো তাহলে গুরু সঙ্গে সঙ্গে পড়া থামিয়ে তার অপভাষা প্রয়োগের জন্য অপরাধ হিসেবে শাস্তি দিতেন তারপর পড়া শুরু হতো। এই শুচিতার সঙ্গে যুক্ত ছিল স্নেহ, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। গুরু ও শিষ্যের স্নেহ ও শ্রদ্ধা সম্পৃক্ত যে ভাবরস তার মধ্যে দিয়ে গুরু যে জ্ঞান দিতেন শিষ্য তা সহজেই পেত। এখন অবশ্য চতুষ্পাঠীগুলি সমাজের সহায়তা ও শ্রদ্ধা হারিয়েছে। গুরু তখনকার দিনে গরীব হলেও গৌরবহীন ছিলেন না। কিন্তু আজকের গুরুরা যথেষ্ট ধনী ছাত্ররা দরিদ্র হলেও তাদের জ্ঞান তারা ছাত্রদের মধ্যে বন্টন করেন না। তবে আজকের চতুষ্পাঠীতে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকা দরকার। সেই সঙ্গে জগতের সর্ববিধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ও ইতিহাস যেন এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠতে পারে তা খেয়াল রাখতে হবে। চতুষ্পাঠীগুলিকে এমনভাবে প্রসারিত ও বিস্তৃত করতে হবে যেন তা পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় বা অবলম্বন হয়ে ওঠে।

এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষা বিকশিত হলে বিদেশের জ্ঞান ও বিজ্ঞান এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শাস্ত্রবদ্ধ যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হবে আর তখন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। দরিদ্র এই ভারতবর্ষের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা দেশ বিদেশের নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করে যদি প্রাকৃতজন তথা ব্রাত্য অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রীতি ও স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা দান করে তবে আমাদের দরিদ্র ও দুর্গত দেশের বহু সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হবে। প্রাকৃত তথা বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাই এগিয়ে আসলেই দরিদ্র ভারতের শিক্ষার দুর্দশা ঘচবে। দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ দেশীয় অধ্যাপকদের দ্বারা স্বল্প অর্থের বিনিময়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ও উপজাতি গৌষ্ঠীভুক্ত প্রাকৃতদের যথার্থ শিক্ষিত করার চেষ্টা করছে। শিক্ষার এই অগ্রগতি তাদের জাতির চেতনাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে। দেশীয় অধ্যাপকদের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা দেশীয় শিক্ষার্থীদের মনন ও চেতনের বিকাশ ঘটাবে সেই সঙ্গে দেশ ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হবে। একইসঙ্গে ঐ চতুষ্পাঠীগুলিতে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিতে হবে। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তুলতে হবে তবেই সমগ্র দেশের প্রাকৃত বা ব্রাত্য শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের সঙ্গে শিক্ষক বা গুরুর সুসম্পর্ক তৈরি হবে। বাংলা ভাষাতেই সকল বিষয়ের চর্চা করতে হবে। ইতিহাস, ভুগোল, দর্শন, পুরাণ, ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা বাংলা ভাষাতেই করতে হবে। বাংলাকে সকল বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে তবেই দেশের অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্কের বন্ধন সহজ ও সুদৃঢ় হবে। এর ফলে একটি জাতি হিসেবে ভারতবর্ষ শিক্ষায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করবে। 'শিক্ষায় স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি ১৯৪৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার সাধনা, পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধের মধ্যে। সেই সঙ্গে আধুনিক ভারতের শিক্ষার সংকটের দিনে কীভাবে বৈদিক সমাজের সর্বজনীন স্বাধীন শিক্ষাকে ব্যবহার করা যেতে পারে তার পথনির্দেশ রয়েছে এই প্রবন্ধে।রবীন্দ্রনাথ ভারতের শিক্ষার সাধনাকে সর্বকালের অন্যতম শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাই তিনি পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা দূষিত নগর থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার ধারাকে পুনরায় প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীনকালের মতোই গুরু শিষ্যের যোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হলে ছাত্র-ছাত্রীর মননের বিকাশ হবে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আন্তরিকতা তৈরি হবে।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মাবে প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনভাবে পাঠ করার সীমাহীন আনন্দ লাভ করবে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে সংকীর্ণতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে মন। তাই তিনি বিশ্বভারতী নির্মাণ করেন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে দয়া, করুণা, মৈত্রী ও ক্ষমা করার ধর্ম গড়ে উঠবে। সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উদার মানসিকতা লাভ করবে এই জন্য প্রকৃতির মধ্যেই শিক্ষালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'শক্তিপূজা', 'শক্তি সাধনা', 'দেবীপক্ষের মাতৃপূজা' 'বেদমন্ত্রে মাতৃপূজা', ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে মাতৃসাধনার কল্যাণময়ী রূপটি ব্যক্ত হয়েছে। রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদের মাতৃভাবের সেই প্রাক সাধনাকে মাথায় রেখে জগজ্জননীর পূজা সম্পূর্ণ হয়েছে। জগজ্জননীর পূজাই আমাদের অন্তরাত্মার শক্তিকে জাগ্রত করবে এবং সকল সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখাবে। প্রকৃতি বা নারী সকল শক্তি ও গতির আধার। এই মাতৃশক্তির রূপবৈচিত্র্য প্রবন্ধগুলিতে ফুটে উঠেছে।

'আয়াহি শক্তিরূপিণী' প্রবন্ধটি আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে শক্তির সঙ্গে কল্যাণের সম্বন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। দেবী দুর্গার জননীসত্তার মধ্যে কল্যাণের আদর্শ আপামর সকল দুর্গত সন্তানদের দুঃখ দূর করবে তাই দেবী দুর্গার আগমনের জন্য ব্যাকুল আহ্বান বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত। মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, মহত্ত্বের আদর্শকে নিশ্চিত করতে এই মহাশক্তির আধার দেবী দুর্গার আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটবে। মানবের পরিত্রাতা রূপে আগমন ঘটবে আদ্যাশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গার। দুর্গা ও অসুর দুজন শক্তির আধার ও উপাসক কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রশ্নে। অসুরের শক্তি কল্যাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় তাই সে আসুর অন্যদিকে যার শক্তি কল্যাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে হল দৈব। দুর্গা ও অসুর উভয়ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োজন কিন্ত সেই শক্তিকে যে মানব কল্যাণের কাজে ব্যবহার করবে সেই বিশ্বের ত্রাতা দৈব বা দেবতা হিসেবে পরিচিত হবেন।

মানুষের বিজ্ঞান সাধনায় এই কল্যাণ ও অকল্যাণের সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর। বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যখন আকাশে উঠতে শিখলো তখন মানবকল্যাণের কথা ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস লীলায় মেতে উঠলো যার ফলে এই বিজ্ঞানশক্তি আসুরে পরিণত হলো। যুদ্ধবিমান ও রকেট সেই ধ্বংসাত্মক লীলাকে সার্থক রূপ দিল। অণু ও পরমানু নিয়ে বিশ্বচরাচরে যে শান্ত, সংযত ও সুন্দর

রূপের সহবস্থান তা ভেঙে গেল যখন মানুষ অনুর ভিতর থেকে প্রচণ্ড শক্তিকে আবিষ্কার করে মানুষের অকল্যাণের কাজে ব্যবহার করলো। দেশ-দেশান্তরে, গ্রহ-গ্রহান্তরে মানুষের এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা মানবের কল্যাণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে চিরকাল। উপনিষদের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে দেবতা ও অসুরের বিরোধ। এ প্রসঙ্গে উপনিষদের মতকে টেনে প্রাবন্ধিক বলেছেন-‘প্রথমে শক্তিই জন্মিল পরে কল্যাণ আসিয়া সেই শক্তিকে দৈব করিয়া তুলিল। এই দেবে-অসুরে, কল্যাণে-অকল্যাণে তখন হইতে সংগ্রাম চলিল।’[৫] দেবগণ তাদের ইন্দ্রিয় শক্তি প্রাণশক্তির সাহায্যে সমস্ত অকল্যাণকে পরাজিত করতে যুদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধে অসুরশক্তি পরাজিত হয়েছে কিন্তু তবুও তারা বারবার তাদের অশুভ শক্তি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে বিশ্বজগত।

ভারতের সর্বত্র মঙ্গলের জন্য আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার কল্যাণময়ী শক্তির প্রয়োজন। মহাশক্তি দুর্গার সর্বশক্তি তার সন্তান ও সন্ততিদের নিয়ে গঠিত। তার জ্যেষ্ঠ সন্তান গণপতি গণবিজ্ঞানের শক্তিতে ভরপুর , দেবী লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের, দেবী সরস্বতী সর্ববিদ্যার, দেবীর নিম্নে প্রতিষ্ঠিত সিংহ শক্তি ও উপরে কল্যাণময় শিব যিনি সর্বদেবতার কল্যাণ সাধন করেন। দেবী দুর্গার এই অখণ্ড সব কল্যাণশক্তি যদি সাধনাতে যুক্ত করা যায় তবেই ভারতবর্ষের অখণ্ডের সাধনা সম্পূর্ণ হবে। তবেই সকল অশুভ শক্তির বিনাশ হবে ও সকল অন্ধকার দূর হবে। দেবী দুর্গার আবাহনে সকল পাপ, সকল অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। দুর্গার সমস্ত দিকের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুর্গত ও বিধ্বস্ত ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই পরম সত্য(সর্বশক্তি) ও অখণ্ড সত্যের সাহায্যে সকল নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। এই মহাশক্তির সাধনাতে দেবী দুর্গা অসুরকে বধ করবে সর্বশক্তি দিয়ে। ভারতবর্ষ দেবী দুর্গার সর্বাঙ্গপূর্ণশক্তি দিয়ে সকল অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাবে এবং তার সকল শত্রুকে পরাজিত করবে। ভারতে এই অখণ্ড সর্বাঙ্গপূর্ণ শক্তির জন্যই আজ দুর্গার সাধনা চাই। সকল ভেদাভেদ , সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে এই দেবীর মহাশক্তি প্রয়োজন। ভারতের একান্ন পীঠ হল দেবীর একান্ন অঙ্গ। এই একান্ন পীঠের সম্মিলিত সাধনাই ভারতকে রক্ষা করবে। প্রাদেশিকতা হল মাতৃঅঙ্গছেদন । তাই আমাদের প্রয়োজন সেই মাতৃ অঙ্গছেদনের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। পুরাকালের সেই মা আজ অখণ্ড ভাবে অখণ্ড ভারতের সবদিকে মঙ্গলকে সূচিত করবে। তাই দরকার ভৌগলিক অখণ্ডতার পাশাপাশি চিন্ময় অখণ্ডতা।

তাই চেতনা, বুদ্ধ, শক্তি, কান্তি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতা প্রভৃতি নানা চিন্ময় রূপে দেবী দুর্গার স্তব করতে হবে। এই স্তবের মধ্যেই রয়েছে অখণ্ড সাধনার ব্যঞ্জনা। এই স্তবই হল অখণ্ড মহাশক্তির সাধনা। এর দ্বারা দেবী দুর্গার পরাক্রমের সঙ্গে জেগে উঠে সকল শত্রুর দমন করবে ও অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাবে চিরতরে। অখণ্ড ভারতের ঐক্যের জন্য দরকার সকল মানবের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা। স্বার্থ বিযুক্ত হয়ে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সর্বব্যাপী কল্যাণ চেতনার দ্বারা যে জাতি রাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা চিন্তা করবে সেই জাতি সবার আগে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যাবে।

'স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর –সাবধান সাবধান' প্রবন্ধটি ১৯৪৯ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীন ভারতকে কীভাবে সাম্যের আদর্শে গড়ে চিরন্তনভাবে স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখা যায় তার পথনির্দেশ রয়েছে এই প্রবন্ধে। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসানে স্বাধীনতা এলেও সে স্বাধীনতায় ভারতবাসীকে সাবধানে থাকতে হবে তা না হলে স্বাধীনতা আবার হাতছাড়া হতে পারে। প্রত্যেকের যা যা প্রাপ্য অধিকার তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সকলকে সমান ভাবে সম্পদ বন্টন করে দিতে হবে। ধনী ও দরিদ্র প্রত্যেকে সমভাবে সকল অধিকার ভোগ করবে।

দেশের অর্থনীতির জন্য প্রর্যাপ্ত অর্থের দরকার আছে তবে সেই অর্থের জন্য জুলুম ঠিক নয়। একদল ধনী দেশের সব অর্থ-সম্পদ নিজস্ব করে নিয়ে অবাধে অন্যকে পীড়ন করবে এটা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য কখনো কাম্য নয়। সব দেশে চার রকমের শক্তি থাকে। ব্রাহ্মণের হল জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্ষত্রিয়ের হল রক্ষা ও শাসনের জন্য অস্ত্রবল, বৈশ্যের হল কৃষি বাণিজ্য, শূদ্রের হল শ্রমশক্তি। সমাজে এই চার শক্তি বিযুক্ত থেকে সকলের কল্যাণার্থে পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করে। সবার কল্যাণ যদি সকলের লক্ষ্য হয় তবে একে অন্যের শক্তি কখনোই গ্রাস করতে চাইবে না। আমরা ব্রাহ্মণ্য শক্তির রাজত্বের অত্যাচার চাই না। বৈশ্য রাজত্বও চাই না আবার শূদ্র রাজত্বও চাই না। এতে অত্যাচার প্রবল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা চাই সবার সমান সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার। সেটাই যথার্থ সাম্যবাদ।

কাজেই আজ শুধু ধনীকে সাবধান হলে চলবে না ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সাবধান হতে হবে জাতি ও দেশের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে। যার যা ঐশ্বর্য তা সর্বজগতের কল্যাণার্থে যতটা সম্ভব সকলের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। লেনিনের সাম্যবাদ প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অর্থ ও সম্পদের সম বন্টনের কথা বলেছেন। অসাম্য দূর করতে না পারলে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে বুর্জোয়া ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ কোনো দিন ঘুচবে না। তাই একনায়কতন্ত্র নয় সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ প্রয়োজন যেখানে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমান অধিকার লাভ করতে পারবে। সার্বিক কল্যাণের পথ থেকে যাতে কেউ সরে না আসে তার জন্য সাবধানবাণী ব্যক্ত হয়েছে। আজ ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবাই ভেদ বিভেদ মুছে সকলকে এক হতে হবে। স্বাধীন ভারতকে রক্ষার এটাই আদর্শ পথ। সম্প্রদায়ভেদ ও প্রদেশভেদ যেন আমাদের সত্তা ও দেশের সত্তকে খণ্ডিত না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সকলে এক হলে তবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হবে। সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হলে জাতি ও দেশের সব দৈন্য দূর হবে ও সকল বিভেদ মুছে যাবে। তাই স্বাধীনতা লাভের পর সাবধান হতে হবে যেন কোন ভাবেই উচ-নীচু, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে, কৃষক-জমিদারের মধ্যে বুর্জোয়া-শ্রমিকের মধ্যে অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে বিভেদ না গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা এক অমূল্য রত্ন, তাকে টিকিয়ে রাখতে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থশক্তির কোনোভাবেই যেন অত্যাচারের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

'ভারতের মানবতাধর্ম' প্রবন্ধটি পূর্বাশা পত্রিকায় ১৩৫০ এ প্রকাশিত। সব সাধনায়, সব পূজায় , সব তত্ত্বে মানুষই মুখ্য, দেবতা গৌণ। এই প্রবন্ধে সেই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। ভারতের ধর্ম গ্রন্থ থেকে শুরু করে মহাকাব্য, এমনকি প্রাচীন ধর্ম ও সাহিত্য থেকে শুরু করে সকল সাধনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ এবং তার মহত্ত্ব । এই প্রবন্ধে সেই মানব ধর্মকেই তুলে ধরা হয়েছে। মানব ধর্মই ভারতের চিরকালীন ঐশ্বর্য। জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের আদিতে মানুষ ও তার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জৈনদের চতুবিংশ তীর্থংকর সবাই মানুষ। বৌদ্ধদের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব সবাই মানুষ। রামায়ণ-মহাভারত- ভাগবতে দেবতারা আছেন কিন্তু তারা সকলে মানবের মহত্ত্বকে ঘোষণা করেছে। পুরাণে শিব ও বিষ্ণুকে ভক্তেরা আপন মন দিয়ে মানুষরূপে রচনা করেছিলেন। শৈব ও বৈষ্ণব সাধনায় মানব রসের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা গেছে। পুরাণে এই সব দেবতা ছাড়া আছেন রাম

কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার। তাঁরা দেবতা হলেও মানুষ। এই সব অবতারের মধ্যেও মানুষ বড়ো দেবতা ছোট। বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুর চেয়ে ব্রজের কৃষ্ণ মহত্তর। আর নবদ্বীপের মহাপ্রভু চৈতন্যের মাধুর্য ও মহিমায় বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবনের দেবত্ব অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

মানুষ হল জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। পিতামহ ভীষ্ম 'মহাভারতের' শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠিরকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "গভীরতম সত্য তোমাকে বলি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। অর্থাৎ- 'গুহ্যং ব্রক্ষত দিদং বো ব্রবীমি/ ন মানুষাচ্ছ্রে ষ্ঠত্রং হি কিঞ্চিত।"[৬] এই তত্ত্বই তো হাজার বছর পরে চণ্ডীদাস বলেছেন-'শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'[৭] বাউলদের ভাষাতেও একই প্রতিধ্বনি-'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।'[৮] রামানন্দের প্রেম ধর্মের সাধনায় মানুষ হল আদি ও মানুষ হল অন্ত। বৈষ্ণব ভাগবতদের মধ্যে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী এরা মানবভাবেই ভগবানের সাধনা করেন। ভাগবতেরা চিরদিনই মানব ভাবেই ভগবানকে চেয়েছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাব দিয়ে ভগবানকে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার বৈষ্ণব কবিতায় –দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই/ প্রিয়জনে –প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/তাই দিও দেবতারে, আর পাব কোথা! দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'[৯] এমনকি 'গীতাঞ্জলিতে'ও দেবতা খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দেবতা মন্দিরে নেই তিনি আছে মানুষের মধ্যে যে মানুষ খেটে খেটে মরছে, চাষ করছে। 'বিসর্জন' নাটকেও দেবতার অস্তিত্ব যে মানুষের প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। 'ভারততীর্থ' কবিতায় সাগরতীরের পূণ্যতীর্থে নর দেবতাকেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দাদু, কবীর, রবিদাস প্রভৃতি সাধক তাদের সাধনার কেন্দ্রে মানুষকে রেখেছেন।

এই মানব দেবতার কথা সে যুগে সাধু সাধকেরা বলেছেন আজ এ যুগে সাহিত্য ও কবিতায় সর্বত্র সেই মানব দেবতার অস্তিত্ব প্রবল। আজ রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং সাম্প্রদায়িকতায় এই দেবতা রূপ মানবের নির্যাতন চলছে। তাই কবীর দুঃখ করে বলেছিলেন-'দেবতা আজও তোমার প্রতিষ্ঠা হয়নি, তোমার উপাসক আজও এসে দেন নি দেখা।'[১০]

ক্ষিতিমোহনের 'ব্রাত্য' প্রবন্ধটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্রাত্য একজন মানুষ যে সকল নিয়মকে অগ্রাহ্য করে সনাতন শাস্ত্রবিধিকে অতিক্রম করে ক্রমাগত

সামনের দিকে এগিয়ে চলে। সমস্ত নিয়ম, পুরানো আচার-সংস্কারকে পিছনে ফেলে লক্ষ্মীছাড়ার মতো যে যাত্রা করে সেই হল ব্রাত্য। যে শিক্ষাদীক্ষার প্রাচীর ভেদ করে এগিয়ে চলে। সে বিদ্রোহী। আদতে এই ব্রাত্য হল আমাদের গতি ও স্থিতি সত্তা। যে গতি আমাদের জীবনকে চঞ্চল ও অস্থির করে তোলে। এই গতি জীবনের সকল শোক, ব্যথা, বেদনাকে ভুলিয়ে সর্বমানবকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার শক্তি দান করে। এই ব্রাত্যের গতি সকল রক্ষণশীলতা ও প্রাচীনতাকে পেছনে ফেলে সকল সংস্কারকে পশ্চাৎ এ রেখে আমাদের প্রগতিশীল করে তোলে। এই ব্রাত্য হল সেই গতিবাদী সত্তা যে আমাদের জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে অসীম আনন্দ দান করে। এই ব্রাত্যেই সকল অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখায় আমাদের। এই ব্রাত্যের গতিবাদের জীবন দর্শন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের গতিবাদের জীবন দর্শনের গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ব্রাত্য সত্তা সকল শিক্ষা ও জ্ঞান কে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে মহৎ বা বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায়। নবজ্ঞান, নবশক্তি ও নব প্রেরণা লাভ করা সম্ভব ব্রাত্যের দ্বারা। ব্রাত্য হল সেই চেতনা যার দ্বারা আমরা নতুন পথে অপরিমিত বেগে চলার রসদ লাভ করি। ব্রাত্য আমাদের জীবনের সকল ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেয়। ব্রাত্য হল বিশেষ থেকে নির্বিশেষ একটি উপলব্ধি যা আমাদেরকে কাল থেকে মহাকালের দিকে যাত্রা করতে সহযোগিতা করে এবং একই সঙ্গে একক থেকে সর্বজনীন করে তোলে। ব্রাত্য হল সেই অনুভূতি যা আমাদের ক্ষুদ্র ও সীমা ছাড়িয়ে বৃহৎ ও অসীমের সঙ্গে মিলিত করায়। ব্রাত্য হল সেই মনন যার দ্বারা আমরা সাহিত্য ও শিল্প রচনা করার শক্তি ও প্রেরণা লাভ করি। ব্রাত্য হল আমাদের জীবনদেবতা যে আমাদের সকল অন্ধকার দূর করে আলোর সহযাত্রী হয়ে ওঠে। ব্রাত্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো সেই পুরুষ ও নারী সত্তা যার বীরত্ব, শৌর্য ও বীর্য আমাদের জীবনের চরাই-উতরাই পথে চিরকাল বাঁচার মন্ত্রে পরিণত। ব্রাত্য সকল শিল্পীর অন্তরের আর এক শিল্পী ও সাহিত্যিক যে সৃষ্টি করে অবিরত নতুন বিশ্ব। ব্রাত্য তাই সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীর। জাগতিক সকল সৌন্দর্য এই ব্রাত্যের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে তাই ব্রাত্য সৃজনশীল।

ক্ষিতিমোহন সেনের বলিদান(১৩৪৭) প্রবন্ধে বলীর হিংসাত্মক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ ও পশু বলির প্রচলন থাকলে মধ্যযুগের সাধকদের বিরোধীতার কারণে এই রীতি কিছুটা হলেও কমতে থাকে। একদিকে ধর্ম-প্রেম-অহিংসা আর অন্যদিকে অধর্ম-

সন্দেহ-হিংসার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকে শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় হয় জয়সিংহের আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। জয়সিংহের আত্মহত্যা প্রাচীন কালের প্রচলিত প্রথা পশুবলিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেয়। প্রথা নয় শেষ পর্যন্ত দয়া ও মৈত্রীর জয় ঘোষিত হয়। বলি কথাটার মূল অর্থ উৎসর্গ। দেবতাকে যা নিবেদন করা হোত তাকে উৎসর্গ বলা হোত। সকল সাধনার মূলে আছে এই উৎসর্গ। এই নিজেকে উৎসর্গ না দিলে প্রেম, শক্তি, জ্ঞান কিছুই লাভ করা যেত না। তাই ইহুদী-খ্রিস্টিয়-মুসলমান শাস্ত্রে এব্রাহাম নিজের বদলে আপন পুত্রকে উৎসর্গ বা Secrifice করতে চেয়েছিলেন। কর্ণ ও তার পুত্র বৃষকেতুকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ ছাড়া সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। সে প্রেমের হোক অথবা শাক্তের সাধনা হোক। ভগবানকে প্রেমের শক্তিতে পেতে হলে বৈষ্ণবের নিজেকে বলি দিতে হয়। শৈব-বৈষ্ণব-জৈন সবাই নিজের মন্দিরে পুষ্প-চন্দন-অর্ঘ্য বলি দেয়। কিন্তু মানুষ যখন আপনাকে উৎসর্গ না করে ছাগ পশুকে বলি দিতে লাগল তখন থেকে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ তৈরি হল। মন্দিরে পশুবলি যথার্থ বলিদান নয়, সদর্থক বা যথার্থ বলিদান হল শাক্ত পূজকের শক্তিপূজা ও বৈষ্ণবের প্রেমপূজা। যেখানে হিংসা ও রক্ত নয় প্রেমই হল সাধনার মুখ্য পথ। দয়া, করুণা, মৈত্রী, দান ইত্যাদি এই সাধনার উপজীব্য বৈশিষ্ট্য। এই পূজার আসল লক্ষ্য হল সকল জীবের কল্যাণ ও মঙ্গল।

‘শ্রীকৃষ্ণ’ প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে যুগে যুগে নানা মানবের দল এসেছে এবং নানা সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ভারতে বেদপূর্ব বৈদিক আর্য, অবৈদিক আর্য, আর্যেতর নানা শ্রেণির ও নানা মতের অনার্যরা উচ্চ-নীচ সভ্যতা নিয়ে পাশাপাশি থেকেছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ না করে পরস্পর বিভিন্ন মতবাদ ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করেছে। ভারতে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন সংস্কার ও সভ্যতার মধ্যে নানা বিরোধ ও বৈষম্য ছিল কিন্তু সেই বৈষম্যের মধ্যে যোগস্থাপন করেছেন যুগের মহাপুরুষেরা। এই মহাপুরুষেরা এক একটি নবযুগের স্রষ্টা।

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র মানুষের মধ্যে বৈষম্যকে দূর করেছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার মধ্যে তিনি যোগের সেতু স্থাপন করেছিলেন। রামের সেই সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্ন মানব ও সাধনাকে যুক্ত করে অখণ্ড ভারত গঠন করা। চণ্ডাল ও শবর জাতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে রামচন্দ্র

এক মহান চরিত্রে পরিণত। ত্রেতার পর এল দ্বাপর যুগ। এলেন যোগগুরু শ্রীকৃষ্ণ। যার জীবনটাই একটা যোগসাধনা। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ক্ষত্রিয় রাজবংশে আর পালিত হন ব্রজের গোপকুলে। ব্রজভূমির প্রেমলীলার মধ্যে তিনি যোগসূত্র গড়ে তোলেন।

মহাভারতে এই কৃষ্ণ ছিলেন কর্মময় আবার গীতায় জ্ঞানময় এবং ভাগবতে প্রেমময়। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেম এই তিন আদর্শ সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এক সূত্রে বাঁধলেন তিনি। তিনি সকল বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও যোগ স্থাপন করলেন। বাল্যে ব্রজধামে প্রেমের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পশু ও মানুষের মধ্যে সমভাবে প্রীতি বিলিয়ে দিয়েছেন। প্রেম বন্টনের ক্ষেত্রে জাতিগত কোনো পক্ষপাত তিনি করেননি। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে, কর্মে, মতে ও আচরণে একজন আদর্শ ও খাঁটি মহামানব। তিনি পরিপূর্ণ গৃহী হয়েও গার্হস্থ্যে, কর্মী হয়েও কর্মক্ষেত্রে, সংসারী হয়েও সংসারে, বীর হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের কর্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে পালন করেছেন। এই বিষয়ে তার মহত্ত্ব অতুলনীয়। কৃষ্ণের মানবত্বের মধ্যে মহামানবের অসীম স্বরূপের মহিমা বিরাজ করছে তাই কৃষ্ণ এত আপন ও এত প্রিয় আমাদের। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিশ্বের সর্বত্র উপলব্ধি করেছন। তাই অর্জুনকে বলেছেন-"আমিই ক্রুত, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমিই অন্ন, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, আমিই আহুতি।"[১১] এই আত্মানুভূতি বিশ্বলোকর সঙ্গে তার যোগসূত্র রচনা করেছে।

মহাভারতের প্রথম দিকটায় শ্রীকৃষ্ণ বেশ মানুষ ছিলেন। শেষের দিকটায় ক্রমে তাকে দেবতা করে তোলা হয়। কিন্তু গীতাতে তার প্রিয় বন্ধু অর্জুন তাকে মানুষ বলে ভালোবেসেছেন। মানুষ হয়েও তিনি গীতায় পুরুষোত্তম। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুন তাকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন। দৈব সত্তাকে যখন মানুষের মধ্যে দেখা যায় তখন তার মধ্যে বিশেষ মহিমা ও রস অভিব্যক্ত হয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-"আমি ক্ষর-অক্ষরের অতীত বলিয়াই লোকে বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।"[১২] শুধু দেবতা হিসেবে নয় যে তাকে সর্ববিদ হিসেবে জেনেছে যে তাকে সর্বভাবে ভজনা করেছে সেই তাকে উপলব্ধি করতে পারবে। সীমা ও অসীম, মানব ও দেবতা এই সব বিভেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সব সময় সেতু ও যোগসূত্র স্থাপন করে গিয়েছেন। যে দিকে বিচ্ছেদ ও ব্যবধান সেদিকে তার যোগসেতু স্থাপনের পরম সাধনা ক্রম বিকশিত হয়েছে।

প্রতিবারই জন্মতিথিতে কৃষ্ণ চিরজীবন্ত কারণ তার মৃত্যুতিথি নেই। আজ একুশ শতকে জন্মাষ্টমীতে, তার পূণ্য জন্মতিথিতেও ভক্তের অন্তরে তিনি চীর জীবন্ত। দেহের দিক দিয়ে তার অবসান হলেও চিন্ময়রূপে তার আধ্যাত্মিক জীবন মৃত্যুহীন আমাদের কাছে। তার জীবন তার রক্তমাংসের দেহের মধ্যে সীমাবদ্‌ধ ছিল না। তার জীবন ছিল তার আদর্শ ও সাধনার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। আমাদের সাধনা ও তপস্যা আজ তার চিন্ময় জীবনের একমাত্র আশ্রয়। তাই আমরা সকল ক্ষুদ্রতা, জড়তা ত্যাগ করে তাকে জীবন্ত রাখার জন্য জন্মতিথি পালন করি। অন্তরের ভক্তি দিয়ে তার উপস্থিতিকে আমরা চিরদিন সজীব করে রাখি। আজ নিত্য রাষ্ট্র ও সমাজে চলছে লোভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘর্ষ, চলছে দ্বন্দ্ব, আঘাত, সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলি। এই হিংসা, লোভ ও সংঘর্ষ দূর করার জন্য আজ সেই যোগগুরু কৃষ্ণের প্রয়োজন। তারই আগমনে আমাদের জীবনের সকল বিচ্ছেদের মেঘ কেটে যাবে এবং দুঃসহ ব্যথার দিন গুলির অবসান হবে। জগতে সকল মানবের ভেদ ও বিভেদ একদিন তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন আজ আবার তাকে সেই বৈষম্য ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান অন্তরের মধ্যে ব্যক্ত হোক এটাই প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য। আজ কৃষ্ণের আগমন পুনরায় পৃথিবীতে মৈত্রীর আবহকে নির্মাণ করবে। ক্ষিতিমোহন সেন তার ‘ভারত শিল্পের ত্রৈগুণ্য’, ‘জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা’, ভারতীয় সংগীতে হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পচর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। মেঘের উৎসব ও মেঘের গান নিয়ে কজলী ও মেঘের গান প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ গুলিতে বর্ষার বহু রাগ রাগিনী ও গানের পরিচয় পাওয়া গেছে । এছাড়া আমাদের সমাজে বিশেষত বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা-ধর্ম-রাজনীতি নারীদের অধিকার ও মর্যাদা কতখানি ছিল তা ফুটে উঠেছে।

পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের কালচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে। যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন ভারত ও বর্তমান আধুনিক ভারতের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। উদারতা ও কল্যাণের গুণে ভারতের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্র শিল্প জাতিভেদ ও ধর্মভেদকে অতিক্রম করে সার্বভৌম ও সর্বজনীন আদর্শের সাহায্যে সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে তার ব্যখ্যা তিনি সংকলিত প্রবন্ধ গুলিতে করেছেন। কীভাবে মুসলিম ও হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বিভেদের ঢেউ পেছনে ফেলে সম্প্রীতির মন্ত্রে এক যোগে সাধনা করেছে তা আমরা এই প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের দ্বারা ভারতের শিল্পক্ষেত্র যে

গুণান্বিত তা ব্যক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক ক্ষিতিমোহন সেন। শক্তি ও সাম্য-মৈত্রীর বিনিময়ের সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে সমৃদ্ধ ও বিকশিত হতে পারে বলে তার বিশ্বাস। প্রাচ্য তথা ভারতের সাম্য-মৈত্রীর ধারণাকে য়ুরোপের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রাত্মক চেতনা ধিরে ধীরে লোপ পাবে। ভারতের প্রেমের জাগৃতি ও মিলন সকল জাতিকে মিলন উৎসবের সঙ্গে মিলিত করবে। শুধু শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে নয় কল্যাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সমগ্র সামাজিক কর্ম ও সাংস্কৃতিক সাফল্য। প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক যুগে বসন্ত উৎসবের বৈচিত্র্য থাকলেও সব কালে সব মানবের মধ্যে প্রেম ও মিলনের ঋতু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে এই বসন্ত। ‘ব্রাত্য’ প্রবন্ধে গতিও স্থিতির দর্শনকে তুলে ধরেছেন। পুরানো সংস্কার, পুরানো নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙে ব্রহ্ম ও দেবতার স্বরূপ এই ব্রাত্যরাই মুক্তির আনন্দকে নিশ্চিত করেছে। শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রবন্ধে বৈদিক সমাজে গুরু ও শিষ্যের যে আন্তরিকতা, স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ তাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষায় স্বাধীনতার সর্বজনীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিজ্ঞান, কলা, ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃতি সমস্ত বিভাগে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। একইসঙ্গে ভারত হয়ে উঠবে সকল দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার স্বাধীন অধিকারের সর্বজনীন ক্ষেত্র। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা যাতে তৈরি না করে তার জন্য শিক্ষায় সর্বজনীন স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বৃহত্তর অর্থে পাশ্চাত্যের সীমানা ভেদ করে ভারত হয়ে উঠবে পৃথিবীর অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই আদর্শে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, সেই আদর্শে প্রাচীন ভারতে নালন্দার নির্মাণ। স্বাধীনতা কেন্দ্রিক প্রবন্ধে স্বাধীনতার আনন্দ থাকলেও সম্পদের সম বন্টনের দিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন। অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব, উচ্চ বর্গ ও নিম্ন বর্গ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য সকলের সমান অধিকার স্বাধীনতাকে অটুট রাখবে বলে তার ধারণা। এই ধারনায় তিনি মার্কস এর সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ ও লেনিনের আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের সমাজ তথা রাষ্ট্রে সাম্যবাদী চেতনা বজায় থাকলে স্বাধীনতা যে চিরস্থায়ী হবে তা তিনি জানতেন। কিন্তু সমাজে এই সাম্য চিরকাল থাকে না। ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্যহীন এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে উঠুক ভারতবর্ষ এটাই তিনি চেয়েছিলেন। তার প্রবন্ধে বারবার তাই যোগসূত্র স্থাপনের ভাবনা রূপায়িত। ‘শ্রীকৃষ্ণ’ প্রবন্ধে কৃষ্ণের দ্বারাই সকল বৈষম্যের মধ্যে যোগস্থাপনের কথা বলেছেন। কৃষ্ণ তার কাছে যোগগুরু যিনি তার মানবত্বের মহত্ত্ব দিয়ে সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণতা, অর্থের লোভ,

হিংসা ও প্রতারণা দূর করে ভারতের শান্তি ও স্থিতি অম্লান রাখবে। শক্তিপূজা কেন্দ্রিক প্রবন্ধে শক্তির সঙ্গে কল্যাণের ধারণা সমস্ত শত্রুর বিনাশ করবে এবং দুর্গত ও বিপর্যস্ত ভারতকে রক্ষা করবে। ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবতা, নদী, উৎসব সকল ক্ষেত্রে ভারতের সাধনা একই। এই একই সাধনা পরস্পরের মধ্যে মিলনের বার্তা চিরদিন বহন করবে। মানব ধর্ম বা মানবতাই যে সকল ধর্মের মূল শক্তি তা তিনি বলেছেন। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে সব ক্ষেত্রেই মানুষ বড়ো দেবতা ছোটো। রাম ও কৃষ্ণ দেবতা হলেও তারা মানুষ। সব ধর্ম সাধনার আদি ও অন্ত জুড়ে মানুষ হয়েছে প্রধান। মানব ভাবেই ভগবানকে চেয়েছে বিশ্বজগত। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেই দেবতাকে খুঁজে পেয়েছেন চিরদিন। সমকালীন সময়ের দাবীর কথা চিন্তা করলে আধুনিক যুগে মানুষের মহত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটাই চিরসত্য। মনন ও চিন্তনের প্রগাঢ়তায়, জ্ঞানের পরিপূর্ণতায়, তথ্যের নিপুণতায়, তত্ত্বের গভীরতায়, যুক্তির স্পষ্টতায়, বর্ণনার দক্ষতায় ও ভাষার সারল্যে ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ গ্রন্থটি আধুনিক গবেষক পাঠকের কাছে নব গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে এই আকাঙ্ক্ষা রেখে আলোচনার ইতি টানলেম।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১। ভারতের সাম্য-মৈত্রীর সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারত পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-৪০৫
২। অখণ্ড ভারতের সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৩
৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৪
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৫
৫। আয়াহি শক্তিরূপিণী, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারত পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-৩৬৪
৬। মহাভারতম, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অনুবাদক হরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-৩৫৭
৭। ভারতের মানবতাধর্ম, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারত পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-২০৫
৮। তদেব, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারত পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-২০৬
৯। বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, পৃষ্ঠা-৪৩
১০। 'ভারতের মানবতাধর্ম, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারত পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-২০৮, মৎসম্পাদিত, কবীর, ২/৩৭)
১১। শ্রীমদভগবতগীতা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অনুবাদক হরকুমার রায় বিশ্বাস, দশম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১২৩
১২। তদেব, একাদশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫২